The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 83-89, ISSN 2306-3920

অন্ত্যজ : কারা, কেনো, কীভাবে

রেজওয়ানা আবেদীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** পৃথিবী কেবল সমভূমির সমাবেশ নয়, এখানে যেমন রয়েছে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল, তেমনি পৃথিবী জুড়ে যে অসংখ্য সমাজ-কাঠামো, তাতেও রয়েছে নানা শ্রেণিভেদ। রয়েছে নানামুখি সামাজিক বৈষম্য তথা উৎপিড়ন। যুগে যুগে, দেশে দেশে জাতিভেদ প্রথা বিশেষজ্ঞদের লেখনীতে নানা মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। নিম্নশ্রেণির এই মানুষগুলোই দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয়ে উঠেছে গবেষণার উপকরণ। মূলত তাদেরকে কেন্দ্রে রেখে এ প্রবন্ধটিকে সাজানো হয়েছে। অন্ত্যজ এই শ্রেণি, সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে কীভাবে চর্চিত হয়েছে তা-ই আমাদের লক্ষ্য।]

শোষিত-নিষ্পেষিত শ্রমিক শ্রেণি ইতিহাসের নানা পর্যায়ে গবেষকদের জবানিতে নতুন নতুন খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে তাদের জীবনযাপনে বা সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হতে দেখা যায়নি। বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে ছিল হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদে[১] 'অন্ত্যজ' বা অস্পৃশ্য পর্যায়ের, সে-ই জাতভেদ প্রথা সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তীকালে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে হয়েছে 'নিম্নবর্গ' বা 'নিম্নবর্ণ'। (Colin Mcintosh: 228)। আবার কোথাও বা হয়েছে 'ব্রাত্যশ্রেণি'। এই শিল্পায়নের যুগে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে সমাজ জীবনেও নানা রূপরেখা সূচিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কল-কারখানার প্রসারে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। ফলে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার একটি কালো অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছে। কৃষিপ্রযুক্তিতে একদিকে যেমন আধুনিকীকরণ হয়েছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া 'কৃষিজীবী' মানুষগুলো খেত-মজুর থেকে কারখানার শ্রমিকে বা নতুন শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে।

অন্ত্যজদের কথা প্রসঙ্গে কঙ্কর সিংহ 'ব্রাত্য' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৭৫)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ভাষাতেও :

> ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত
> দেবালয়ের মন্দির দ্বারে
> পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
> *পত্রপুট*, পনেরো নম্বর কবিতা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫২ বঙ্গাব্দ : ৪২)

---

* **ড. রেজওয়ানা আবেদীন :** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বাংলা চলিত 'জাত' অর্থে 'বর্ণ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ 'cast'অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত। ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী 'caste' বলতে, 'asystem of deviding Hindu society into classes: the cast system' (*Cambridge AdvancedLearner'sDictionary*, Edited by Colin Mcintosh, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Fourth Edition, p. 228)

কিন্তু শুধু শূদ্র এবং অন্ত্যজদের এই কালে এসে 'ব্রাত্য' শব্দায়নের মাঝে আটকে রাখতে হয়ত রবীন্দ্রনাথও আপত্তি জানাতেন। 'ব্রাত্য' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় শব্দটির অর্থের সম্প্রসারণ বোধগম্য হবে। 'ব্রত' এবং 'ব্রাত্য' এই শব্দ দুটি থেকে ব্রাত্য সমাজের উৎপত্তি। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৭৫)। ভারতীয় উপমহাদেশে ঐ ধরনের ব্রাত্য সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়– জাতিগত ও বৃত্তিগত। পূর্বের বর্ণগত অনগ্রসরতা এবং বর্তমানের বিত্তগত অনগ্রসরতা প্রায় সমার্থক। জন্মগত দিক থেকে যারা নিম্নবর্গের, তারাই যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়ে এসেছে। জাতিগতভাবে সব শূদ্ররাই ব্রাত্য। তার নীচে যারা, সেই অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ, যাদের বলা হয় পঞ্চম বর্ণ, তারাও ব্রাত্য। যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণ বিভাজনে পঞ্চম বর্ণের কোনো অস্তিত্ব নেই। আর বৃত্তিগত ব্রাত্য হলেন তারা, যারা নিজ বর্ণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো কর্মের মাধ্যমে জীবিকা-নির্বাহ করেন। সাধারণত এই ব্রাত্যেরা উচ্চ তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) থেকে পদস্খলিত। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সকল সঙ্করজাত অসবর্ণ সন্তানদের 'ব্রাত্য' নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। (৭৬)

বিখ্যাত গবেষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ ব্রাত্য শব্দের অর্থ করেছেন, শূদ্র থেকে ক্ষত্রিয়ে জাত বিশেষ বলে। (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬: ১৬৪৮)। অর্থাৎ তিনি ব্রাত্য বলতে বর্ণসংকরদের বুঝিয়েছেন। রাজশেখর বসু তাঁর *চলন্তিকা*'য় 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থে বলেছেন– ব্রতভ্রষ্ট, বর্ণোচিত সংস্কারবিহীন, পতিত। তিনি ব্রাত্য বলতে অসবর্ণ সন্তানদের গ্রহণ করেননি। (রাজশেখর বসু ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ : ৫৪৭)। ধর্মসূত্রে অসবর্ণজাত সন্তানদের বলা হয়েছে ব্রাত্য। মনু আরো ব্যাপক অর্থে 'ব্রাত্য' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু অসবর্ণ সন্তানরাই নয়, যারা বর্ণোচিত সংস্কার পালন করেনি কিংবা করতে পারেনি তিনি তাদেরকেও 'ব্রাত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১৮ বঙ্গাব্দ : ২৯)। মনুর ভাষায় :

অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ ॥৩৯॥

অনুবাদ : এই তিন বর্ণের বালকগণের যদি উক্ত নির্দিষ্ট কালের মধ্যে [অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গর্ভোৎপত্তি কাল থেকে আরম্ভ ক'রে ষোল বছরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছরের মধ্যে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছরের মধ্যে] উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহ'লে তারা সাবিত্রীভ্রষ্ট অর্থাৎ উপনয়নভ্রষ্ট হয় এবং তখন তারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। (এতে দ্বিজাঃ সংস্কারহীনাঃ শূদ্রপ্রায়া ভবন্তি" ।–রামচন্দ্র)। এরা আর্য অর্থাৎ শিষ্টগণের দ্বারা নিন্দিত হয় ॥ (মনু ১৪১৮ বঙ্গাব্দ : ২৯)

নৈতৈর পূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৪০॥

অনুবাদ : ব্রাত্যগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না করলে, এই অপবিত্র ব্যক্তিদের সাথে ব্রাহ্মণ আপৎকালেও ব্রাহ্মসম্বন্ধ অর্থাৎ বেদসম্পর্কিত যাজন-অধ্যাপনাদি সম্বন্ধ এবং কখনোই যৌনসম্বন্ধ অর্থাৎ কন্যাদান-কন্যাগ্রহণাদি বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করবেন না॥ (২৯)

পানিণি তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ সূত্রে 'ব্রাত্য' শব্দ থেকে 'ব্রাতীন' শব্দের উৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'ব্রাতীন' শব্দটির অর্থ হলো, যে সকল মানুষ কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা-নির্বাহ করেন। পানিণির সূত্রের উপর পতঞ্জলির যে মহাভাষ্য, তাতেও 'ব্রাত্য' শব্দের অনুরূপ অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে 'ব্রাত্য' কেন্দ্রীক আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শব্দটির যত ব্যাখ্যাই থাকুক না কেনো, সব সময়েই তা হীনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে পতিত, সংস্কারহীন, ব্রতভ্রষ্ট, বর্ণচ্যুত ও বৃত্তিত্যাগী হিসেবে। ভারত উপমহাদেশে বিশেষভাবে উত্তর ভারতে, আর্যদের আগমনের ফলে এদেশে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদের বক্তব্য স্মরণীয় :

> এই রকম ব্রাত্যেরাই বাঙ্গালা দেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রথম বাহক ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহাদের ধর্মাচারে ও ধর্মচিন্তায় বহিরাগত অনেক কিছু মিশিয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির বীজ নষ্ট হইয়া যায় নাই। পূর্বভারতে এবং অন্যত্র কোথাও কোথাও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রথমে কী রূপ লইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় অথর্ববেদে আছে। এই ধর্ম পূর্ব-ভারতের (এবং বাঙ্গালা দেশের) নিজস্ব বলা যায়। পরে পশ্চিম হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঢেউ তাহার উপর বারে বারে বহিয়া গিয়াছে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পলিও যথেষ্ট পড়িয়াছে। (সুকুমার সেন ১৯৭৮ : ১০)

বেদের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে নানা পণ্ডিত বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। বৈদিক যুগেই বর্ণাশ্রম ধর্ম চালু হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে রয়েছে নানা মতান্তর। তবু শেষ পর্যন্ত পুরোহিত শ্রেণি যে বিজয়ী হয়ে ব্রাহ্মণরূপে বর্ণাশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাপে নিজেদের তুলে নিয়ে, তাদের কোনো কোনো সহোদরকে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণে স্থান দিয়ে, বিজিত অনার্যদের শূদ্ররূপে বর্ণবিভাজন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাও ভারতের ধর্মসভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস। (রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯৯৩ : ২০)। সর্বনিম্ন বর্ণের এই শূদ্ররা, যারা 'ব্রাত্য' নামে পরিচিত, তারাই অন্ত্যজ, ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নবর্গ বা নিম্নবর্ণ।

তারপরেও ব্রাহ্মণরা উচ্চ তিন বর্ণের (এর মধ্যে নিজেদের শ্রেণিভুক্ত কিছু ব্রাহ্মণও ছিলেন) অনেককেই অন্ত্যজদের দলে নামিয়ে দিয়েছেন। তাদের বলা হয়েছে পতিত, যারা বর্ণচ্যুত। 'পতিত' শব্দের অর্থ হল ভ্রষ্ট ও স্বধর্মচ্যুত। শূদ্ররা পতিতরূপেই চিহ্নিত ছিল। তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল শুধু উচ্চবর্ণের সেবা।[২] অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পতিত হয়ে যান ধর্মচ্যুত হয়ে। প্রাচীন ভারতে 'ধর্ম' অর্থে সবসময় কৌলিক বৃত্তিকেই বোঝানো হয়েছে। আমরা বর্তমান কালে যে অর্থে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করি তার সাথে কোনো অর্থেই ভারতীয় বেদ-পুরাণ-মহাকাব্যে ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দটির সাযুজ্য নেই। বৈদিক যুগেই প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন বর্ণের সন্তানদের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে তাদের মিলনকে কখনো বন্ধ রাখা যায়নি। বলতে গেলে তা অপ্রতিরোধ্যই ছিল। তাছাড়া শূদ্রেরা তো নিয়োজিতই ছিলেন উচ্চবর্ণের সবরকম 'সেবাব্রতে'। তাঁদের সাথে মিলনকেও তাই ঠেকানো যায়নি। ফলে জন্ম হয় নানারকম বর্ণসংকর সন্তানের। জাতি হিসেবে তারাও হয়ে গেলেন ব্রাত্য। এইভাবে ব্রাত্য সমাজের দলই ভারী হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৮০)

একজন 'অসাধারণ' ব্রাত্যের কথা বলা প্রয়োজন। অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেও মহাভারতে অভিহিত করা হয়েছে 'ব্রাত্য' এবং 'পতিত ক্ষত্রিয়' বলে। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল বৃষ্ণি বংশে। বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশজাত সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এই দুই বংশের লোক কখনো তাদের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কার্য করেননি। শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাত্য বলা হলেও আসলেই কি তিনি ব্রাত্য কি না, তা প্রশ্নাতীত। *মহাভারতে*, *হরিবংশে* কিংবা অন্য শাস্ত্র-পুরাণে তাঁকে কখনো ব্রাত্যদের দলে দেখা যায়নি। তিনি *মহাভারতের* মহারণ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থান। তিনি নির্ভেজাল ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তবু রক্ষা করলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম। ব্রাহ্মণদের তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার

---

২. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদনা ও অনুবাদ),*মনুসংহিতা*, পৃ.১৫
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভু কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥৯১॥

অনুবাদ : প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্ধারণ করে দিয়েছেন,– তা হ'ল কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা ॥৯১॥

কাছে আসতে দেননি। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৭৬, ৭৭)। তাঁদের তিনি ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন– যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় রকম বৃত্তিতে :

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিপ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

অনুবাদ : অধ্যপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (receiving of gifts)– এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ করে দিলেন ॥৮৮॥ (মনু ১৪১৮ বঙ্গাব্দ : ১৪, ১৫)

বর্ণব্যবস্থার নামে হিন্দুধর্মে যে জাতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল মূলত শ্রমবিভাজনেরই নামান্তর। বাংলায় ধর্ম বা সমাজসংস্কারক যা-ই বলা হোক না কেনো, প্রথম বিদ্রোহী পুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৭-১৫৩৩)। (১৬)। তাঁর ভাষ্যেই পাই :

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-
দগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো
ন বেদাঢ্যোহপি নাস্তিকঃ ॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ বেদ জানে অথচ নাস্তিক– সে পূজার পাত্র নয়। যে চণ্ডাল হয়েও সদাচারী, প্রবল ভক্তির উজ্জ্বল অগ্নিতে যার জাতের পাপ পুড়ে গেছে, সে বিদ্বান লোকের কাছেও পূজ্য ॥ ৬ ॥ (৩৪১)

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) *হরিজন* নামে একসময়ে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি শূদ্রদের নামকরণ করেছিলেন 'হরি'। শ্রীকৃষ্ণের সমমর্যাদায় শূদ্রদের স্থান দিয়ে তিনি তাদের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকায় তিনি শূদ্রদের অধিকার আন্দোলনের পক্ষে লেখালেখি করেছেন। শূদ্রদের একটি অংশের নামের আগে নমঃ যোগ করে তাদের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়নি। (কঙ্কর সিংহ ২০১০ : ৪৬)

জাতের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ভারতীয় সমাজের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধানের জনক বি.আর. আম্বেডকর (১৮৯১-১৯৫৬) স্বয়ং ছিলেন একজন দলিত শ্রেণির মানুষ এবং নিজ জাতির মানুষের জন্য কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। অম্বেডকরের মতে, হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যে চারটি বর্ণ বা শ্রেণি ছিল, পরবর্তীকালে সেসব শ্রেণিগুলোই এক একটি অবরুদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। যেখানে কেবল জন্মসূত্রেই প্রবেশাধিকার মেলে। এভাবেই জাতিভেদ প্রথার জন্ম হয়। জাতিভেদ প্রথা ভগবানের সৃষ্টি অথবা তা ভারতীয় সমাজের বিশেষ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল– সাধারণ্যে প্রচলিত এই ধারণাগুলো তিনি খারিজ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতিভেদ প্রথার বিকাশ বুঝতে গেলে, বিষয়টিকে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। ব্রাহ্মণরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করেন, রাজা বা ক্ষত্রিয়রা তা কার্যে পরিণত করতেন। এইভাবে ধর্মগ্রন্থে বিশেষ জাতির জন্য নির্ধারিত কর্তব্যগুলো পালন করার অর্থ কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, রাজার আদেশের প্রতি আনুগত্যও তাতে প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ধর্ম ও রাষ্ট্র একত্র হয়ে নিম্নতম শ্রেণি অর্থাৎ শূদ্রদের প্রথমে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বে বন্দি করল, পরে তারা অস্পৃশ্যতার নাগপাশে বাঁধা পড়ল। (অর্জুন ডাঙলে ২০০১১ : ৩৬, ৩৭)। বঞ্চনা, শোষণ বা সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে গঠিত নিম্নবর্গের একাংশের সঙ্গে দলিত শ্রেণির মানুষের একাংশকে মেলানো হয়েছে অনেক প্রসঙ্গে। ফলে 'নিম্নবর্ণ', 'নিম্নবর্গ' ও কখনো কখনো 'দলিত' সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে।

ব্রাত্য শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্যে অনেক বিবর্তন হয়েছে আধুনিক কালে। আধুনিক সমাজ থেকে ব্রাত্য সমাজ এখন বহুদূরে বিস্তৃত। সমাজতত্ত্ববিদ, কবি, সাহিত্যিকদের কাছে 'ব্রাত্য' শব্দটির নতুন

মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাদের ভাষ্যে সকল শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষরাই ব্রাত্য। সমাজের তথাকথিত হাড়ি, মুচি, ডোম, মেথর, বাউরি, বাগদি, জেলে, কাহার, এরাই শুধু ব্রাত্য নয়। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, সুতার, বণিক, নমশূদ্ররাও ব্রাত্য। তাঁদের কাছে নতুন করে ব্রাত্য হয়ে উঠে এসেছে সর্বহারা ভিখারী, যত আশ্রয়হীন মানুষ, বস্তিবাসী, কুলি, মুটে, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবী। তাদের আলাদা করে শূদ্র বলে চিনতে হয় না। জাত-পাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এরা 'ব্রাত্য'। আজকের পৃথিবীতে তারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বেড়াজালে ব্রাত্য নয়। এদেশে সমাজে Open Class System প্রচলিত হবার পর নিম্নবর্গের মানুষ বর্ণগত অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বা বিবাহ সূত্রে উচ্চবর্ণের সমাজে উঠে আসতে পারে। আবার বিপরীত চিত্রও দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে উচ্চবর্গের মানুষ 'ব্রাত্য'জনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, দেশভাগের ফলে, যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাতে সেই ছিন্নমূল মানুষগুলোর অনেককেই আজ-'ব্রাত্য' জন বলে চিহ্নিত করলে হয়ত খুব একটা ভুল বলা হবে না।

'অন্ত্যজ' বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র 'সবার পিছে সবার নিচে' সর্বহারাদের আমরা বোঝাতে চেয়েছি। তবু 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনা স্মরণ করা প্রয়োজন। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য = অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে) = অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট-পুরুষের (ঋগ্বেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষজাত-চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই হলো অন্ত্যজ। এক্ষেত্রে 'শূদ্র' অর্থে কোনো ঘৃণার কথা নেই কারণ পবিত্র বিরাট-পুরুষের সকল অঙ্গই পবিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ (বিপরীত) সন্তানদের বলা হতে লাগল অন্ত্যজ। তখন থেকে 'অন্ত্যজ' শব্দের প্রতি সমাজের অন্য তিন বর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ করা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে বিধান দেওয়া হলো যে, শাস্ত্রসম্মত সবর্ণ (সমবর্ণ বা জাতিভুক্ত) এবং অসবর্ণ (ভিন্ন বর্ণ বা জাতিভুক্ত) বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে সংস্রবের সন্তানরাই অন্ত্যজ। আবার 'অন্ত্য' অর্থে নীচ, তাই নীচ কুলে যার জন্ম সে-ই নীচাশয়, অর্থাৎ অধম ব্যক্তিই 'অন্ত্যজ'। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১৯৭৩ : ৭৪)

সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষদের সাধারণত 'অন্তেবাসী'ও বলা হয়। পূর্বে *ঋগ্বেদের* কালে গুরুর কাছে থেকে শিষ্য শিক্ষা গ্রহণ করত বলে শিষ্যদের তখন 'অন্তেবাসী' বলা হতো। (বিজনবিহারী গোস্বামী১৯৭৮ : ভূমিকা)। কিন্তু বর্তমানে গ্রামের শেষে বা নগরপ্রান্তবাসী 'চণ্ডাল' শ্রেণির অন্ত্যজদের বলা হয় 'অন্তেবাসী'। শুধু চণ্ডালদের ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রযোজ্য বলে বর্তমান গবেষণায় 'অন্তেবাসী' কথাটিকে ব্যবহার করা হয়নি। অন্ত্যজ ও ব্রাত্য শব্দ দুটির অর্থ অনেক সময় সমার্থক হয়ে ওঠায় 'অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে বহুবার 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্যভাষীরা সমাজরীতির দিক দিয়ে দুটি দলে বিভক্ত ছিল। "প্রথম দল যাযাবর ও প্রধান-নাম 'গ্রাম্য' এবং দ্বিতীয় দল, যাহাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে ব্রতবাহ্য অর্থাৎ আর্যসংস্কৃতিচ্যুত– এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।" (সুকুমার সেন ১৯৭৮ : ১০)। ব্রত+য (হীনার্থে) অর্থ সংস্কারহীন যজ্ঞ-এই হলো আক্ষরিক আর্থে। 'ব্রাত' অর্থাৎ সমূহ শব্দ থেকে মনু গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে বলেছেন 'ব্রাত্য'! *অথর্ববেদ* ব্রাত্যদের প্রশংসায় মুখর। এই বেদকে বলা হয় ব্রাত্যদের বেদ। যজ্ঞপতিদের কাল অতীত হয়ে গেলে সেই সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হতো। এরা আর্যদের নিন্দনীয়। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১৯৭৩ : ১৬৫৮)। দেখা যাচ্ছে, আর্যসমাজে যে-দলের মর্যাদা কম ছিল সেই দলকেই প্রথমে 'ব্রাত্য' বলা হতো। পরে গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণদেরই শুধু বলা হয়েছে 'ব্রাত্য'। আরো পরে সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই ব্যাপক অর্থে আর্যসংস্কৃতি থেকে শুধু চ্যুত

নয়, যাদের সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, সেই সব বর্ণ বা জাতিকেও 'ব্রাত্য' বলা চলে। আর তাই 'অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগে ভুল হয় না। বর্তমান কালে ইংরেজি Depressed বা Downtrodden[৩] এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'দলিত' কথাটিও ব্যবহার হচ্ছে।

ব্রাত্য শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্যে অনেক বিবর্তন হয়েছে। আধুনিক সমাজ থেকে ব্রাত্য সমাজ এখন বহুদূরে বিস্তৃত। সমাজতত্ত্ববিদ, কবি, সাহিত্যিকদের কাছে 'ব্রাত্য' শব্দটির নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাদের ভাষ্যে সকল শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষই ব্রাত্য। সমাজের তথাকথিত মুচি, হাড়ি, ডোম, মেথর, বাউরি, বাগদি, জেলে, কাহার– এরাই শুধু ব্রাত্য নয়। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, সুতার, বণিক, নমঃশূদ্ররাও ব্রাত্য। এই 'ব্রাত্য' মানুষগুলোই কখনো হয়েছে নিম্নবর্গ, কখনো বা অন্ত্যজ। আমরা অন্ত্যজদের পেয়েছি সর্বহারা ভিখারী, যত আশ্রয়হীন মানুষ, বস্তিবাসী, কুলি, মুটে, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবীদের মধ্যে। তাদের আলাদা করে শূদ্র বলে চিনতে হয় না। জাত-পাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এরা 'অন্ত্যজ'। আজকের পৃথিবীতে তারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বেড়াজালে অন্ত্যজ নয়। এ দেশে সমাজে Open Class System[৪] প্রচলিত হওয়ার পর নিম্নবর্গের মানুষ বর্ণগত অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বা বিবাহ সূত্রে উচ্চবর্ণের সমাজে উঠে আসতে পারে। আবার বিপরীত চিত্রও দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে উচ্চবর্গের মানুষ 'অন্ত্যজ'জনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাতে সেই ছিন্নমূল মানুষগুলোর একাংশকে আজ 'অন্ত্যজ' বলে চিহ্নিত করা হলে বোধ করি ভুল হয় না।

সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে সাহিত্যিকগণ আধুনিক কালে এসেই যে ভাবতে ও লিখতে শুরু করেছেন, তা নয়। অনুসন্ধানকে গভীরে নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের অচ্ছুৎ শ্রেণির প্রতি ছিল লেখকদের আগ্রহ। যার প্রমাণ তাঁদের সৃষ্ট-সাহিত্য। নিম্নজনের আখ্যান যদি অচ্ছুতদের লেখায় প্রকাশ পেত, তবে জানা যেত প্রকৃত সত্য। তা সম্ভব হয়নি, সনাতন বর্ণাশ্রম বৃত্তিভেদের আধারে তাদের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে শত শত বছর ধরে। তারপরও সমাজের এই অস্পৃশ্য মানুষদের প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের বিষয় করেছেন বিভিন্ন সাহিত্যিক।

---

৩. অভিধান অনুযায়ী 'Depressed' বলতে, "not having enough money, jobs, or business activity : In a depressd market, it's difficult to sell goods unless you lower your prices. an economically depressed area." এবং 'Downtrodden' অর্থে "treated badly andunfairly : the downtrodden masses uptown."(Cambridge Advanced Learner's Dictionary, do p. 406 & 458)

৪. An open class system is the stratification that facilitates social mobility, with individual achievement andpersonal merit determining social rank. The ierarchical social status of a person is achieved through their effort. Any status that is based on family background, ethnicity, gender, and religion, which is also known asascribed status, becomes less important. There is no distinct line between the classes and there would be more positions within that status. Core industrial nations seem to have more of an ideal open class system. Category: Sociological terminology, *Wikipedia*, the free encyclopedia, Accesed on 2/11/16

সহায়কপঞ্জি

অর্জুন ডাঙলে (২০১১), 'দলিত সাহিত্য : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', *দলিত*, (সংকলন ও সম্পাদনা : দেবেশ রায়), তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

কঙ্কর সিংহ (২০১০), *আমি শূদ্র আমি মন্ত্রহীন*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৯৭৩), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ২য় ভাগ*, ২য় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

বিজন বিহারী গোস্বামী (১৯৯২) *অথর্ব বেদ*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা : বিজন বিহারী গোস্বামী), তৃতীয় মুদ্রণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১৮ বঙ্গাব্দ), *মনুসংহিতা*, (সম্পাদনা ও অনুবাদ : মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বিতীয় প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), *রবীন্দ্র রচনাবলী* (বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা

(১৯০৪), 'ব্রাহ্মণ', *সঞ্চয়িতা*, দশম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৯৭৬), *ঋগ্বেদ সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ড*, (অনুবাদ : রমেশচন্দ্র দত্ত), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

রাজশেখর বসু (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), *চলন্তিকা*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৭৮), *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেটলিমিটেড, কলকাতা

সুশোভন সরকার (১৯৯৬), 'গ্রামশির চিন্তা', *গ্রামশি : জীবন ও চিন্তা*, (সম্পাদনা : নরহরি কবিরাজ), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬), *বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা

Antonio Gramsci (1982), *Selections from Prison Notebooks (1929-1935)*, reprinted, (edited by : Lawrance and Wishart), London

Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Edited by Colin Mcintosh, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Fourth Edition, Cambridge

An open class system, Category : Sociological terminology, *Wikipedia,* the free encyclopedia,Accesed on 2/11/16

[Abstract: The earth is not a plain land only. There are also hills, mountains, rivers, forests etc. Similary there are innumerable social structures all around the world where there exists various class descriminations such as harrasments on different types of people. Through the ages the caste system presents itself with different dimensions in the writins of scholars and experts. The people of this lower caste have became the subject of their research irrespective of time, place and people. This article has been organised mainly keeping them at the centre. Our aim is to finld out how this sub-altern class has been depicted in different fields of literature.]